পুঁটলি

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

পঞ্চাশ হাজার টাকা! গুলির মুখটাই তেতো হয়ে গেল। এত টাকা ডিপোজিট লাগবে! তাও ওইটুকু একটা ঘরের জন্য! কথাটা বলার সময় মোটকু পান্ডার মুখটায় কোনও হেলদোল দেখেনি গুলি। এমন করে বলেছিল যেন ওটা কোনও টাকাই নয়! একটা চেষ্টা করেছিল গুলি। বলেছিল, "দাদা, কম হবে না একটু?"

মোটকু খইনি টিপে ঠোঁটের তলায় লুকিয়ে হেসেছিল, "তুই জগাদার ভাগনে তাই পঞ্চাশ বললাম। অন্য কেউ হলে পঁচাত্তরের কম নিতাম না। শোন, এখানে তো আর থাকবি না। কমার্শিয়াল পারপাসে ঘর নিচ্ছিস। তুই কামাবি আর আমি কি আঁটি চুষব?"

"কেন? মাসের ভাড়া তো..." গুলি একটা যুক্তি সাজাতে গিয়েছিল।

"ভাড়া কি আর চোখে দেখা যায়? বেরিয়ে যায় পাঁকাল মাছের মতো। আসল হল সেলামি। দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরা নতুন বউয়ের মতো। বুঝলি?"

আর কথা বাড়ায়নি গুলি। নতুন বউ আর সেলামি দু'টোই ওর আয়ত্তের বাইরে। ধারণাও বিশেষ নেই এ দু'টো সম্বন্ধে। তিরিশ পার করে বয়স হাঁটা দিচ্ছে সামনের দিকে। কবে আর ধারণা হবে এ সম্বন্ধে তাও জানে না! ইশ, ঋতিপর্ণা যদি রাজি হত!

আকাশের দিকে তাকিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল গুলির। দেখতে দেখতে ষোলোটা বছর যে কোথা দিয়ে কেটে গেল! বর্ধমানের সেই ছোট গ্রাম থেকে আসা গৌরাঙ্গ ভূষণ মুখুটি থেকে কখন যে গুলি হয়ে উঠল নিজেই বুঝতে পারল না। কলকাতায় আসার ওর ইচ্ছে ছিল না মোটেই। কিন্তু মা জোর করে পাঠিয়েছিল। গ্রামে ওদের অবস্থা ভাল ছিল না। ওদের বাড়ির বেশিরভাগ অংশটাই ভেঙে গিয়েছিল আগে। তার ওপর বাবার নিত্যদিনের শরীর খারাপে জমানো সবকিছু ঝড়ের মুখে পড়া আমের বোলের মতো ঝরে গিয়েছিল। থাকার মধ্যে একটু জমি আর সবুজ হয়ে যাওয়া পুকুর। কিন্তু সেটা খাটিয়ে খাবার মতো অবস্থাও ছিল না বাবার। মা তাই জোর করেই একরকম কলকাতায় জগামামার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল ওকে।

মা বলেছিল, "জগা হতে পারে আমার খুড়তুতো ভাই, তবু আপনের চেয়ে বেশি। আমার নিজের ভাই তো খবরই নেয় না আমাদের। আর জগাকে যেই লিখলাম ও রাজি হয়ে গেল তোকে রাখতে! এমন বাজারে কেউ কারও জন্য করে?"

গুলি শুনেছিল চুপ করে। বলতে পারেনি কিছুই। আসলে মাথাতেই ঢুকছিল না যে! ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছিল ওর। জীবনে অতদূরে যায়নি। কলকাতা বলতে, বাংলা সিনেমায় দেখা একটা শহর। সেখানে বড় লোকেরা খুব খারাপ আর গরিবেরা খুব সৎ। জগামামাও তো খুব বড়লোক। তাহলে? মা কেন একটা খারাপ লোকের কাছে পাঠাচ্ছে ওকে? দু'বেলা ঠিক মতো ভাত জোটাতে পারছে না বলে?

জগামামা মানুষটা খুব ব্যস্ত। তাই গুলির দিকে নজর দেওয়ার সময়ই ছিল না! চারতলা বিরাট বাড়িটার একটা ছোট ঘরে জায়গা হয়েছিল গুলির। আর কিছুদিনের মধ্যেই বুঝেছিল কেন জগামামা রাজি হয়েছে ওকে থাকতে দিতে! এমন বিনা পয়সায় কে করবে বাজার সরকারের

www.monersathe.com

কাজ!
তবে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল গুলি। পরে কলেজেও। পাস কোর্সে বি.এস.সি-টাও পাশ করে ফেলেছিল ঠিক। কিন্তু সেটুকুই। পড়াশুনোর সেখানেই ইতি। তারপর থেকে কাছের বাজারে মামার সঙ্গে কাজে লেগে পড়া।
মাসে হাজার তিনেক টাকা হাতে দেয় মামা। সঙ্গে খাওয়া-পরা। দু'হাজার বাড়িতে পাঠায় গুলি। বাকি এক-এ নিজের খরচ চালায়।
জগামামার অনেকগুলো ব্যবসা। সামনের ছাতু মার্কেটের বেশিরভাগটাই মামার দখলে। তার সঙ্গে মিনারেল ওয়াটার, ইলেকট্রনিক দোকান আর ঢালাই লোহার ফ্যাক্টরি।
ওকে বাজারের দোকানগুলোর হিসেবপত্র দেখতে হয়। তার সঙ্গে ওদের মিষ্টির দোকানের পাশের ছোট্ট এক চিলতে একটা ঘরে মামা ওকে মোবাইল রিচার্জের জন্য একটা টেবল চেয়ার দিয়েছে। বলেছে, "দেখ, তোকে একটা ব্যবস্থাও করে দিলাম!"
ব্যবসা! ওকে! যা লাভ হয় এই রিচার্জের দোকান থেকে সপ্তাহের শেষে মামা সবটাই বুঝে নেয়। আসলে ও যে কর্মচারী সেটা ভালই বোঝে গুলি!
তাই তো চেষ্টা করছে নিজে কিছু করতে। গত ন'বছর ধরে হাজার পনেরো মতো টাকা জমিয়েছে ও। কিন্তু মোটকু পান্ডা যে তার তিনগুণেরও বেশি টাকা চাইছে! মামাকে একবার লোনের কথা বলেছিল গুলি।
রাতে খাওয়ার পরে মামা বড় বারান্দার ডেক চেয়ারটায় শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। এটাই জগামামার বিশ্রাম। তখন কেউ খুব একটা কাছে-পিঠে যায় না মামার। তবু নিরুপায় হয়ে পায়ে পায়ে মামার চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল গুলি। তারপর আচমকা মাথা নিচু করে মামার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল।
"আরে আরে!" জগামামা চমকে উঠেছিল খুব, "শোয়া মানুষকে প্রণাম করতে আছে? আর প্রণাম করছিসই বা কেন?"
গুলি নরম গলায় বলেছিল, "আজ আমার জন্মদিন তো, তাই..."
"জন্মদিন?" মামা ঘুরে তাকিয়েছিল এবার, "কত হল?"
গুলি ভুল করে প্রায় বলে ফেলছিল তিরিশ হাজার। আসলে মাসের শেষে দোকান ধরে ধরে হিসেব নেবার সময় মামা তো এমন করেই বলে, "কত হল!"
"তিরিশ," গুলি মাথা নামিয়েছিল।
সত্যি তিরিশ বছরই বটে। কিন্তু জন্মদিনটা যে পুরো মিথ্যে সেটা মামা ধরতে পারেনি। ওর জন্মদিন যে ঠিক কবে সেটা গুলি নিজেও জানে না। গ্রামের দিকে ওসব কেউ মনে রাখে না। ওর বাবা মায়েরও মনে নেই। আর এই দিনটা যে অন্যদিনের চেয়ে আলাদা সেটাও কলকাতায় না এলে জানতে পারত না গুলি। মামার ছেলে-মেয়েদের জন্মদিনের ঘটা দেখে ওর বোধোদয় হয়েছিল যে এটা একটা স্পেশাল দিন। তাই টাকার কথা পাড়তে গিয়ে এই দিনটাকেই ঢাল করেছিল গুলি। ওর মনে হয়েছিল, জন্মদিন শুনলে মামা খুব কিছু রাগারাগি করবে না।
মামা পরনের ফতুয়ার পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে বলেছিল, "এটা রাখ। কিছু কিনে নিস।"
পঞ্চাশ টাকা নয়, আমার দরকার পঞ্চাশ হাজার। গুলি মনে মনে চিৎকার করে উঠেছিল। কিন্তু সেটাকে আর শব্দে বদলাতে পারেনি।
জগামামা বলেছিল, "আর কিছু বলবি?"
গুলি ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করেছিল, "মামা, পঞ্চাশ হাজার টাকা লোন পেতে গেলে কী করতে হয়?"
"লোন? পঞ্চাশ হাজার টাকা?" মামা হেসেছিল, "তুই নিবি নাকি? তা কোল্যাটেরাল কী রাখবি? মানে শুধু হাতে তো আর কেউ ওই টাকা দেবে না!"
"কো-কো..." গুলি কী করবে বুঝতে পারছিল না।
"এমন কোঁ কোঁ করলে হবে? তুই কে যে তোকে কেউ খালি হাতে টাকা দেবে? তোর লাগবে টাকা?"
জগামামা যে এমন সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে ফেলবে কথাটা ভাবতে পারেনি গুলি।
মামা উত্তরের অপেক্ষা না করে উঠে পড়েছিল চেয়ার থেকে। ঘরে যাওয়ার আগে বলেছিল, "তোর লাগলে আমায় বলিস। তোদের গ্রামের ভিটেটা আর সঙ্গের জমিটুকু নাহয় জমা রাখবি। দিয়ে দেব টাকা।"
শ্রীকৃষ্ণ যে কেন কংসকে কেলিয়ে লাট করে দিয়েছিলেন খুব ভাল বুঝতে পারে গুলি। ওদের কিছুটা জমি তো আগেই মা টাকার জন্য মামার কাছে জমা রেখেছে। গুলি জানে ওটা জমা নয়, বেহাত হয়ে গেছে। বাবার চিকিৎসায় সব গেছে। মা কী করে ফেরত দেবে ওই টাকা! আর এখন বাকিটুকুও মামা চাইছে!

জন্মদিন যে ঠিক কবে সেটা গুলি নিজেও জানে না। গ্রামে ওসব কেউ মনে রাখে না। বাবা মায়েরও মনে নেই।

রোদটা আজ বড্ড চড়া। মাথা ধরে গেল একদম। এবার সামনের লাইন ঘরে ঢুকতে হবে। এই কাজটা খুব বাজে লাগে। কিন্তু কী করবে, মামার কাজ যে!
জগামামার এমন লাইন ঘর চার-পাঁচটা আছে। সার দেওয়া খুপরি খুপরি ঘর। কমন উঠোন আর বাথরুম। হাজার টাকা করে ভাড়া। লাইটের বিল আলাদা। মাস প্রথমে ভাড়াটা ওকেই তুলতে আসতে হয়। আর প্রতিবার সবাই দিয়ে দিলেও দীপ্য কিছুতেই ঠিক সময়ে টাকা দেয় না! দীপ্যর বয়স প্রায় চল্লিশ। একাই থাকে। কয়েকটা টিউশনি করে। আর কবিতা লেখে। এটাও যে একটা কাজ দীপ্যর সঙ্গে যোগাযোগ নাহলে জানতেই পারত না গুলি।
বছর চারেক আগে প্রথম মাসের ভাড়া নিতে গিয়ে গুলি জিজ্ঞেস করেছিল, "তা কেমন আয় হয় কবিতা লিখে?"
"আয়?" দীপ্য হেসেছিল, "এটা কি তোর মামার গমকল নাকি? কবিতা লিখে টাকা করা একটা সিন। কবিতা হল বিমূর্ত কলা। সবার জন্য নয়। এটা অনুধাবন করতে হলে মন আর মগজ থাকলেই হবে না সঙ্গে থাকতে হবে অন্য এক সেন্স। একে কি আর টাকায় বাঁধা যায়?"
"আয় হয় না?" বিরক্ত লেগেছিল গুলির, "নাম হয়?"
"নাম? কবিতা কি বাংলা কমর্শিয়াল ছবি? শোন, যে কবি কবিতা লিখে পপুলার হয়, সে কবিই না। কবি হবে বঞ্চিত। কবি হবে একক। সে হবে সমাজের মুখে একটা থাপ্পড়। সেখানে টাকা, নাম? ওসব চিপ কথা বলিস না।"
গুলির গুলিয়ে যাচ্ছিল সব। রবি ঠাকুর তো খুব নাম করা কবি। তবে? তিনি চিপ

www.monersathe.com

নাকি? ও আর কথা না বাড়িয়ে বলেছিল, "ভাড়াটা দীপ্যদা।"

"অ্যাঁ?" দীপ্য এই চিপ কথাটা বুঝতে সময় নিয়েছিল একটু। বিমূর্ত কলা বলে আমায় কলা দেখানো? কবি হবে বঞ্চিত? বাঞ্চোতটা ভাড়া না দিয়ে এসব বলছে? সামনের সপ্তাহে ভাড়া না দিলে ওর কবিতার পাছায় লাথি মেরে ঘর থেকে বের করে দেব। তবে টিকে গেছে দীপ্য। দড়ির ওপর হাঁটতে হাঁটতে পার করে এসেছে চারটে বছর।

আজ দরজায় দাঁড়িয়ে দশ মিনিট কড়া নাড়ার পর দরজা খুলল দীপ্য। গুলি দেখেই বুঝল গত রাতের খোঁয়ারি কাটেনি। মদ না-খেলে নাকি কবি হওয়া যায় না। তাই কবিতা কম লিখলেও ক্ষতি নেই, মদ খাওয়াটা মাস্ট। এমন অনেক কবি আছে যারা নাকি আর কবিতা লেখে না, জাস্ট মদ খেয়েই কবি নামে বেড়ায়।

গুলি এসব জ্ঞানের কথা জানত না। দীপ্যই বলেছে ওকে।

"দীপ্যদা ভাড়াটা..." গুলি ঘরের ভেতর পা দিল।

আয়লার প্রভাব কলকাতা কাটিয়ে উঠলেও দীপ্যর ঘরটা কাটাতে পারেনি। ঘরটাকে দেখে গা গুলিয়ে উঠল গুলির। মেঝেতে বমির দাগও চোখে পড়ল।

দীপ্য টলমল করতে করতে টেবলের ড্রয়ার টেনে তার থেকে একটা একশো টাকার নোটের তোড়া বের করল। টাকা গুনে তুলে দিল গুলির হাতে। এত টাকা! গুলির অবাক লাগল খুব। কথায় পেল দীপ্য?

দীপ্য হাসল, "অবাক হচ্ছিস? মায়ের একটা আংটি বিক্রি করতে হল। দু'টো টিউশনি গেছে। যাক, তুই বোস। আমি বাথরুম থেকে আসছি।"

গুলি দেখল দীপ্য টলমল করতে করতে বেরচ্ছে ঘর থেকে। খেয়ালই নেই নোটের তোড়া থেকে বেশ কিছু নোট পড়ে গেছে মাটিতে!

"দীপ্যদা," গুলি ডাকল। তারপর এগিয়ে গিয়ে মাটি থেকে নোটগুলো তুলে ধরিয়ে দিল দীপ্যর হাতে।

দীপ্য হাসল ওর দিকে তাকিয়ে। বলল, "টাকাটা তো মেরেও দিতে পারতিস! আমি তো ধরতেই পারতাম না! এইজন্য বুঝলি, এইজন্য তোর কিচ্ছু হবে না। এক কাজ কর, যখন কিছুই হবে না, তখন তুইও কবিতা লিখতে শুরু করে দে!"

ঋতি চুলটা ঠিক করে নিয়ে নিজেকে দেখল একবার। চোখের কোণে কি ডার্ক সার্কেল হচ্ছে? রাতে না ঘুমোনোর ফল। আসলে খাতা দেখতে হচ্ছে তো! পড়াতে ভাল লাগে ঋতির কিন্তু খাতা দেখাটা খুব বিচ্ছিরি। দেখতে বসলেই খুব ঘুম পায় ওর। আয়নার সামনে থেকে সরে এসে নিজের ব্যাগটা দেখল ঋতি। ভেতরটায় মা হাত দেয়নি তো? গতকাল দীপ্য কোনও কথাই শুনল না। এমন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল! নিজে তো আর কিনবে না। কন্ডোম ঋতিকেই কিনতে হয়। কিন্তু দীপ্য ব্যবহারই করতে চায় না। বললেই বলে, "ওঃ, পরো, খোলো, অনেক হ্যাপা। ভাল লাগে না। তাছাড়া আমি অত মাল খাই, আমার স্পার্মের অত জোর নেই। ভয় পাস না।"

ভয় ঋতি পায় না। পৃথিবীতে কোনও কিছুকেই ভয় পায় না। তাই তো একা হাতে কলেজ, এন.জি.ও আর সংসার সামলে নেয় ঠিক।

ঋতির বাবা নেই। রাজনীতি করত বাবা। এক রাতে টালা ব্রিজের কাছে কারা যেন মোটর বাইক করে এসে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল বাবাকে। ঋতির তখন বছর পনেরো বয়স। তারপর থেকে এই বারো বছর মা আর ওর সংসার। জেঠুর বাড়ির এক পাশে দোতলায় দু'টো ঘর নিয়ে থাকে ওরা। জেঠু, জেঠিমা ভাল মানুষ। কোনও ঝুট-ঝামেলা করে না।

জেঠু বেশি বয়সে বিয়ে করায় জেঠুর দুই যমজ মেয়েই ওর চেয়ে বেশ অনেকটা ছোট। দু'জনেই এবার উচ্চমাধ্যমিক দেবে।

বাবা মারা যাওয়ার পর মা খুব ভেঙে পড়েছিল। আসলে মায়ের চিন্তা ছিল রোজগার। বাবা খুব কিছু ভাল চাকরি করত না। বেসরকারি কোম্পনিতে কেরানি ছিল বাবা। তাই সঞ্চয়ও ছিল না বিশেষ।

গত বছর কলেজের চাকরিটা পেয়েছে ঋতি। তারপর থেকে মায়ের টাকা পয়সার চিন্তাটা গেছে। কিন্তু ঋতিকে নিয়ে খুশি নয় মা। ওর এই ব্যস্ত জীবনযাপনকে মা বলে 'উড়ন চণ্ডী' জীবন। বলে, "এখনও সময় আছে ঋ, এমন করিস না। তোর বাপের মতো হবে কিন্তু।"

রাজনীতি করে না ও। ওদের এন.জি.ও

www.monersathe.com

সামাজিক সমস্যা নিয়ে কাজ করে। কলেজের সময় থেকেই ঋতি এর সঙ্গে যুক্ত। আর এর কাজে নানা জায়গায় যেতে হয় ওকে।

তেমনই একটা জায়গায়, বছর তিনেক আগে দীপ্যর সঙ্গে ওর পরিচয়। তখনও ইউনিভার্সিটিতে পড়ত ঋতি।

প্রথম আলাপেই দীপ্য বলেছিল, "আরে ছাতু মার্কেটের কাছে থাকো না তুমি?"

খুব অবাক হয়েছিল ঋতি, "হ্যাঁ। কিন্তু আপনি..."

"তুমি," দীপ্য হেসে সিগারেট ধরিয়ে বলেছিল, "আমি দেখেছি তোমায়!" ওখানেই ভাড়া থাকি আমি।"

"তাই? আমি দেখিনি তো?" ঋতি হেসেছিল।

"সুন্দরীরা আর কবেই বা আমাদের মতোদের দিকে তাকায়!" দীপ্য হেসে ওর ঝাঁকড়া চুলগুলো নাড়িয়েছিল।

সেই শুরু। তারপর থেকে ওদের আচমকা দেখা হয়ে যেত এখানে সেখানে। পরে ঋতি বুঝেছে এই আচমকাগুলো সবটাই দীপ্যর প্ল্যান করা! গত তিন বছর ধরে ওদের সম্পর্কটা তৈরি হয়েছে। দীপ্যর কাছে ও তুমি থেকে তুই হয়েছে আর ওর কাছে দীপ্য আপনি থেকে নেমে এসেছে তুমিতে।

মা ব্যাপারটা পছন্দ করে না একদম। বলে, "মোদো-মাতাল। ওই লাইন ঘরে থাকে। চল্লিশ বছর হতে চলল রোজগার নেই। কেন অত ঘুরিস ওর সঙ্গে? লোকে কত কী বলে জানিস!"

ঋতি পাত্তা দেয় না, "লোকে তোমার বিপদে তোমায় দেখেছে যে লোকের কথা ভাব তুমি? আমার জীবন আমি বুঝব। আর জানো দীপ্য কত বড় কবি?"

"কত বড়? কই পেপারে তো নাম দেখি না, টিভিতে তো ছবি দেখি না। কত টাকা আয় করে? কবি! ওসব ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো কাজ আমার মোটেও পছন্দ নয়।"

হাসি পায় ঋতির। প্লেটো বুঝতে পারেননি তো মা কী করে বুঝবে কবি-র গুরুত্ব! আর মায়ের পছন্দ অনুযায়ী কি জগৎ চলবে?

সাড়ে ন'টার বাসটা মিস করলে আজ ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাসটা নিতে পারবে না। মাকে বলে সিঁড়ি দিয়ে প্রায় দৌড়ে রাস্তায় নেমে এল ঋতি। আর ঠিক তখনই মেসেজটা এল আবার। এটার জন্য একটা বিশেষ টোন সেট করে রেখেছে ঋতি। কে যে পাঠায়! না, কোনও খারাপ কিছু না। শুধু নানা প্রেমের কোটেশন। নাম্বারটাতে ফোন করে দেখেছে ঋতি। বন্ধ পেয়েছে প্রতিবার। হয়তো মেসেজ করেই অফ করে দেয়। দীপ্যকে বলেছে। দীপ্য হেসেছে। বলেছে, "এটা ভাল। সুন্দরীদের অনেক অ্যাডমায়ারার থাকে। এটাই নিয়ম।"

তবে এটা নিয়ে আর ঝামেলা বাড়ায়নি ঋতি। কী হবে! কোনও অশ্লীল কিছু তো পাঠায় না। তবে যাতে বুঝতে পারে এটা সেই মেসেজ, তাই স্পেশাল একটা টোন সেট করে রেখেছে।

বেশিরভাগ সময়ই ও এই মেসেজটা দেখে না। এখনও দেখল না। কিন্তু মেসেজটা আসাতেই মনে পড়ে গেল ওকে মোবাইলটা রিচার্জ করাতে হবে। ব্যালেন্স খুব কম।

বিরক্ত লাগল ঋতির। একেতেই দেরি হয়ে গেছে তার ওপর রিচার্জ করতে হবে! সামনেই ছাতু মার্কেট। ঋতি দেখল রোগা ফর্সা মানুষটা ওর এক চিলতে দোকানটা খুলে বসেছে। এখান থেকেই রিচার্জ করায় ও। কিন্তু আজ দোকানে পাঁচ ছ'জন দাঁড়িয়ে। এত ভিড়!

ঋতি দ্রুত ভাবল। তারপর এগিয়ে গেল দোকানের দিকে।

"আমায় একটু আগে করে দেবেন? একশো কুড়ি..." ঋতি ভিড়ের বাইরে থেকে গলা তুলে বলল।

"হবে না দিদি। আমরা আগে এসেছি।" একটা রোগামতো ছেলে আগ বাড়িয়ে বলে উঠল সামনে থেকে।

"প্লিজ, আমার ফার্স্ট ক্লাসটা..." ঋতি চেষ্টা করল একবার।

ভিড় আরও কিছু বলত। কিন্তু রোগা ফর্সা মানুষটা তার আগেই বলে উঠল, "আমি ইজি রিচার্জ করে দিচ্ছি। আপনি চলে যান পথে পেয়ে যাবেন।"

"টাকাটা?" ঋতি ব্যাগ খুলল।

"সন্ধেবেলা দিয়ে দেবেন।"

"নাম্বারটা হল..."

মানুষটা শান্ত গলায় বলল, "আমি জানি।"

৩

মানিক সরখেলকে ভয় পায় না এমন লোক ওদের অঞ্চলে নেই। হাওড়ায় ছাঁট লোহার ব্যবসা থেকে শুরু করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভেড়ি, মানিক সরখেলের ব্যবসার হাত আর হাতিয়ার দু'টোই খুব বড়! জগামামা এই একটা লোককেই খাতির করে চলে। মাসকাবারির জিনিস নিজের বড় মুদিখানা থেকে ঠিক সময়ে পৌঁছে দেয় লোক দিয়ে। আর সঙ্গে পাঠায় গুলিকে। বলে, "সব মিলিয়ে দিয়ে আসবি। জানিস তো মানিকের বউটা পড়তে পারে না!"

দীপ্যর এটা ওটা কাজ করে দেয় গুলি। মনে একটা দম-বন্ধ করা কষ্ট নিয়ে হলেও করে দেয়।

সেটা জানে গুলি। বহু বছর ধরে সরখেলদের বাড়িতে যাচ্ছে ও। পেল্লায় একটা চারতলা বাড়ি। উড প্যানেলিং থেকে মার্বেল, যেখানে যা পেরেছে লাগিয়েছে। দেখলে মনে হয় সার্কাসের তাঁবু। গুলি বোঝে বাঁকা পথে টাকাই করেছে লোকটা কিন্তু জীবনে মাপ ব্যাপারটা আয়ত্ত করতে পারেনি।

আজও মাল বুঝিয়ে হিসেব মিলিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসছিল বাড়ি থেকে। গুলির তাড়া আছে একটু। দীপ্যর শরীরটা ভাল নেই। ওকে বলেছে যদি একটু রুটি তড়কা কিনে দিয়ে যায়!

দীপ্যর এটা ওটা কাজ করে দেয় গুলি। মনে একটা দম-বন্ধ করা কষ্ট নিয়ে হলেও করে দেয়। ওর নিজের জীবনকে আশেপাশের সবকিছুর থেকে আলাদা রাখতে চায় গুলি। যাতে কোনও কিছু ওর জীবনে প্রভাব না ফেলে তার জন্য দাঁতে দাঁত চেপে একটা চেষ্টা চালায় ও।

গুলি জানে ঋতির সঙ্গে সম্পর্ক আছে দীপ্যর। কতবার দীপ্যর সঙ্গে ঋতিকে দেখেছে! অঞ্চলে এই নিয়ে একটা আবছা কুয়াশার মতো গুঞ্জন আছে। কিন্তু দীপ্য বা ঋতি ওসবে পাত্তা দেয় না।

ঋতি মেয়েটাকে ছোট থেকেই দেখে আসছে গুলি। আর তখন থেকেই ওকে দেখলে কেমন একটা ভোঁ লেগে যায় গুলির। মনে হয় প্রচণ্ড বৃষ্টির পরে যেন রোদ উঠল। মনে হয় পাহাড়ি ঝরনায় উড়ে বেড়াচ্ছে তুলো কাগজের মতো সব

www.monersathe.com

প্রজাপতিরা।
কিন্তু ও জানে ঋতি ওর দিকে তাকায় না। মনোযোগ দেয় না। জানে, ঋতি ভুলেও গেছে পুরনো কথা। শুধু মাঝে-মধ্যে মোবাইলের রিচার্জ করার সময় কথা বলার সুযোগ পায় গুলি। টাকা নিতে গিয়ে স্পর্শ করতে পারে আঙুল। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হাওয়ায় রেখে যাওয়া ঋতির গন্ধ প্রাণপণে টেনে নিতে পারে বুকের মধ্যে।
গুলি বোঝে এই পৃথিবীতে প্রেমের কোনও গুরুত্বই নেই। আসলে সবটাই হল সামাজিক মর্যাদা। ভেতরে ভেতরে তাই গুটিয়ে থাকে ও। একেক দিন মনে হয় ভালবাসার কথাটা আবার ঋতিকে বললেই তো হয়। কিন্তু তারপরেই ভাবে ও কী করতে পেরেছে গত দশ বছরে যে ঋতির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে! ভয় লাগে গুলির। আবার 'না' শোনার ভয়। আবার অপমানিত হওয়ার ভয়। যদিও দশ বছর হয়ে গেছে সেসবের তবু সেই দশ বছর আগের সন্ধেটা আজও ভুলতে পারেনি গুলি। ভুলতে পারেনি কীভাবে সেই ঘটনার বহুদিন পরেও ওকে আঁচড়াত এক ঝাঁক নেকড়ে! বুকে চেপে ধরত জ্বলন্ত অঙ্গার!
মনের দাগ দেখা যায় না বলেই বোধহয় তার জ্বালা বেশি। গুলি বোঝে যতই ও ছাই চাপা দিয়ে রাখুক না কেন, সেইসব অঙ্গারগুলো আজও যথেষ্ট জীবন্ত!
আজ সকালে বাসস্টপে ঋতিকে দেখেছিল গুলি। নীল-সাদা সালোয়ারের সঙ্গে নীল টিপ। কানেও নীল পাথরের ছোট্ট ঝোলানো দুল।
তখন থেকেই মনটা খারাপ হয়ে আছে ওর। কেমন একটা অবসাদ আসছে। হাতে পায়ে যেন জোর পাচ্ছে না। কেবলই মনে হচ্ছে কী হবে কাজকম্ম করে? কী হবে এই জীবন নিয়ে? মনে হচ্ছে, কার জন্য একটা দিন বেঁচে থাকবে ও!
সকাল থেকে এখন সন্ধে শেষ হতে চলল, তবু মনটা ঠিক হচ্ছে না। থেকেই থেকেই সামনে ঋতিকে দেখতে পাচ্ছে যেন। আর বুকের ভেতরে পাথর গড়াচ্ছে।
রাস্তায় বেরিয়ে একটু অন্যমনস্ক ছিল বলেই প্রথমে মানিকের ডাক শুনতে পায়নি গুলি। কিন্তু দ্বিতীয় ডাকটা কান এড়াল না। এত ভাল একটা বিশেষণ ব্যবহার করেছে মানিক যে মরা মানুষ পর্যন্ত বসে পড়বে শুনলে!
গুলি হাসল, "সরি মানিকদা, শুনতে পাইনি।"
মানিক গাড়ি থেকে নেমে সামনে এসে দাঁড়াল ওর, "জগাদা কেমন আছে রে?"
"ভাল।"
"তুই দীপ্য মালটাকে চিনিস?" মানিক ওর কোলা ব্যাঙের মতো চোখগুলো আরও বড় করল।
"কেন বলুন তো?"
"তোর মায়ের সঙ্গে বিয়ে দেব রে শালা। যা জিজ্ঞেস করছি উত্তর দে।"
গুলি থমকে গেল একটু, বলল, "হ্যাঁ। ভাল লোক।"
"মালটা আমার থেকে গত দেড় বছরে প্রায় পৌনে দু'লাখ টাকা নিয়েছে। ধার। এক টাকাও ফেরত দেয়নি। লোক পাঠিয়েছিলাম। বলে কিনা শরীর খারাপ! আমার ম্যানেজার লকাই বলল তুলে নিয়ে আসবে কিনা। আমি বারণ করলাম। কীসব কবিতা-টবিতা নাকি মারায়! শোন, আমি পড়াশুনো করিনি মানে কিন্তু এই নয় যে পড়াশুনোকে রেসপেক্ট করি না। ওকে আর এক মাস সময় দিয়ে এসেছে আমার লোক। তোকেও বললাম। ওকে বলিস, এক মাস পরে কিন্তু কবিতা লেখা তো কোন ছাড়, হাগতেও পারবে না। বুঝেছিস?"

> গুলি বোঝে এই পৃথিবীতে প্রেমের কোনও গুরুত্বই নেই। আসলে সবটাই হল সামাজিক মর্যাদা।

গুলি মাথা নাড়ল। লকাইকে খুব ভাল চেনে ও। ছ'-সাতটা খুন করেছে। পিস্তল ছাড়া ঘুমতেও যায় না। এদের থেকে দীপ্য ধার করেছে?

খাবার কিনে যখন দীপ্যর ঘরের সামনে দাঁড়াল গুলি তখনও ওর কানে বাজছে মানিক সরখেলের শেষ কথাগুলো, "বলে দিবি একমাস পরে কিন্তু ওকে ওর ঘরের ভেতরেই কেটে রেখে আসব।"
দরজায় দু'বার ধাক্কা দিল গুলি। তারপর পিছিয়ে এসে দাঁড়াল। দু'টো ঘরের মাঝে এটা একটা সরু প্যাসেজ। তাতে চল্লিশ পাওয়ারের একটা ময়লা বাল্ব জ্বলছে। চারদিকে ঝুলে, ময়লায় কালো হয়ে আছে সিলিং।
দীপ্য দরজা অল্প খুলে বেরিয়ে এসেই চট করে বন্ধ করে দিল দরজাটা। অবাক লাগল গুলির। এমন তো করে না!
"এনেছিস? কত রে?"
দাম বলল গুলি। তারপর জিজ্ঞেস করল, "এখন শরীর কেমন?"
"ভাল নেই রে।"
দীপ্য আর কথা না বাড়িয়ে খাবারটা নিয়ে টাকাটা দিল। বলল, "তুই আজ আয়।"
গুলি বুঝল দীপ্য ওকে কাটাতে চাইছে। কিন্তু কেন? ঘরে কে আছে?
ও বলল, "মানিক সরখেলের থেকে তুমি টাকা নিয়েছ দীপ্যদা? ও কেমন মানুষ তুমি জানো?"
দীপ্য যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল, "তুই জানলি কী করে? আর আমি ও ঠিক মিটিয়ে দেব।"
"তুমি পৌনে দু'লাখ টাকা মিটিয়ে দেবে? এত টাকা? জানো ও কী করতে পারে?"
দীপ্য ঠোঁট কামড়াল, "ও ঠিক আমি লোন করে..."
"লোন? কে দেবে তোমায়? কোল্যাটেরাল কী রাখবে?" গুলি তাকাল দীপ্যর দিকে।
"কোল্যাটেরাল?" দীপ্য চোয়াল শক্ত করে ভাবল একটু। তারপর বলল, "সে আমার আছে। তুই যা এখন।"
গুলি তাও বলল, "জগামামা জিনিস বন্ধক রেখে টাকা দেয় কিন্তু। তেমন দরকার পড়লে..."
"তুই যা।" দীপ্য আর দাঁড়াল না। দরজাটা যতটা সম্ভব অল্প খুলে শুট করে আবার ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর।
গুলি চলে যেতে গিয়েও কেমন যেন পাথর হয়ে গেল নিমেষের মধ্যে। ওর বুকের ভেতরে গড়িয়ে পড়তে লাগল মাটি পাথর। হিংস্র নেকড়েরা ছিঁড়ে ফেলতে লাগল ওর বুক। ঝরনার সমস্ত প্রজাপতি ছেঁড়া কাগজের মতো খসে পড়ল ঘাসে।
দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে খাটের ছত্রিতে মেলে রাখা ওই নীল-সাদা কুর্তিটা চেনে গুলি। আজ সকালেই বাসস্টাপে ওটা দেখেছে ও!

৪

আজ সারাটা দিন খুব খাটনি গেছে ঋতির। কলেজের পর ওদের এন.জি.ও-র হয়ে উত্তর কলকাতার একটা রেড লাইট

www.monersathe.com

এরিয়ায় যেতে হয়েছিল। স্যানিটেশনের খুব সমস্যা সেখানে। সেই নিয়ে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেনিং ছিল।
ফেরার সময় থেকেই শরীরটা বইছে না যেন। গা গুলোচ্ছে। অস্বস্তি হচ্ছে। ওখানে ভেজিটেবল চপ দিয়েছিল খেতে। খাব না খাব না করেও দু'টো খেয়েছিল ঋতি। নির্ঘাত অম্বল হয়ে গেছে।
বাসস্টপে নেমেই দেখেছিল যে পশ্চিম আকাশে গোলা পায়রার মতো মেঘ জমছে। আর এখন তো বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে রীতিমতো।
ঋতি খাটের থেকে নেমে আলতো করে পর্দাটা সরালো। ইশ, কী নোংরা! দীপ্য এমন শ্যাবি হয়ে থাকে কেন কে জানে! বললেই বলে, "ক্লিনলিনেস ইজ ওভাররেটেড। যতটা দরকার ততটা পরিষ্কার থাকলেই হল। অত ছুচিবায়ুগ্রস্ত হওয়ার মানে নেই।"
দীপ্যর এটা ভাল লাগে না ঋতির। বড় বড় দাড়ি, ঘাম, মুখে সিগারেটের বা মদের গন্ধ। মাঝে মাঝে খুব বিরক্তি লাগে। সেক্স করার সময় ঠিক যেন আদর করতে পারে না আজকাল। কে জানে হয়তো প্রাথমিক ভাল লাগার চটকা ভাঙার পর মানুষ মাইক্রোস্কোপ হয়ে যায়! আর দীপ্যও যতদিন যাচ্ছে তত বেশি করে কেমন একটা হয়ে যাচ্ছে।
ওকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল ঋতি, "তুমি কি আজকাল ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছ?"
"মানে? কেন?" দীপ্য চোখ ছোট করে তাকিয়েছিল।
"না, কেমন আগোছালো হয়ে গেছ তো। মানে কবিতার লাইনে কি..."
"লাইন?" দীপ্যর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল, "লাইন মানে? এটা কেমন ভাষা? শোন, এখন সবখানেই কম্পিটিশনের যুগ। কবিতাতেও তাই। সবাই সবার মতো গুটি সাজাচ্ছে। আমাকেও করতে হয়। জানি হয়তো সময় লাগবে। তাবলে ফ্রাস্ট্রেটেড হব কেন?"
"কীসের সময় লাগবে? চাকরিও তো করলে না সময় থাকতে! কবিতা লিখে কী হবে?"
"শোন ঋতি, তুই কিন্তু সব জেনেই এসেছিলি আমার কাছে। এখন এসব বলছিস কেন?"
ঋতি বলেছিল, "সেভাবে বলছি না। তেমন হলে সবার বারণ অগ্রাহ্য করে কি তোমার কাছে আসতাম?"
দীপ্য বলেছিল, "ভাল জায়গা থেকে কবিতার বই, ভাল পুরস্কার, এসব একদিনে হয় না। সময় লাগে। সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কের মতো, বুঝেছিস? আর ম্যাক্সিমাম কবিগুলো ত্যাদোর। শালা কবি, না সব পলিটিক্যাল পার্টির খোঁচড় বলা মুশকিল! তাই..."
দীপ্য কবি। বই আছে। নানা সভায় যায় কবিতা পড়তে। কথায় কথায় নানান পণ্ডিতদের কোট করে। প্রথম দিকে এইসব দেখে খুব ভাল লেগেছিল ঋতির। কিন্তু আজকাল কেমন যেন লাগে! যেন বুঝতে পারে দীপ্যর কাছে ওর কবিতা যেন কিছু করতে না পারার একটা অজুহাত। অনেকটা নিজের বক্তব্য না থাকলে যেভাবে হাফ-দিগ্‌গজরা কোটেশন আওড়ায়, সেরকম!
বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে খুব। ওকে বসিয়ে রেখে একজনকে বাসস্টপে এগিয়ে দিতে গেছে দীপ্য। ঋতি এসে দেখেছিল সিড়িঙ্গে মতো একটা লোক বসে মদ খাচ্ছে। ওকে দেখেই লোকটা উঠে পড়েছিল।
ঋতি ঘড়ি দেখল প্রায় আধঘণ্টা হয়ে গেছে। ভেবেছিল দীপ্যর সঙ্গে কথা বলেই

www.monersathe.com

চলে যাবে। মাকে নিয়ে একবার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। কিন্তু দেরি হয়ে গেল বেশ। তার ওপর আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে! ডাক্তার যদি চলে যায়। ঋতি খাটে এসে বসল আবার। অম্বলটা বাড়ল মনে হচ্ছে। গা-টা গুলিয়েই চলেছে। কী যে বাজে লাগছে! যদি একটা হজমোলা পাওয়া যেত!

"ও তুই চলে যাসনি?" দীপ্য দরজা খুলে ঢুকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"কেন? তুমি তো বসতে বললে!"

"হ্যাঁ, মানে..." দীপ্য ঠোঁট চাটল, "আসলে আমায় একটু বেরতে হবে। ভুলে গিয়েছিলাম আজ একজনের বাড়িতে কবিতা পাঠ আছে।"

"এখন?" ঋতি বলল, "সাড়ে সাতটা বাজে। বৃষ্টি হচ্ছে!"

"তো? বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে তো আর পাঠ হবে না। তুই পরে আয়, আমায় বেরতে হবে।"

ঋতি কী বলবে বুঝতে না পেরে উঠে দাঁড়াল। এত রুড কেন হচ্ছে দীপ্য! আচমকা ওর চোখে জল চলে এল।

"দেখ, ফালতু সেন্টিমেন্ট দেখাস না। তোকে স্টুং মেয়ে বলে জানতাম। এমন ভেতো বাঙালি মেয়েদের মতো বিহেভ করছিস কেন?"

জোর করে কান্নাটাকে গিলে নিল ঋতি। তারপর ঘরের বাইরে এসে বলল, "আমায় বললেই পারতে। মাকে নিয়ে ডাক্তার দেখানো ছিল আজ। ফালতু বসে রইলাম।"

দীপ্য তালা দিল দরজায়, 'চল। বড় রাস্তা অবধি অন্তত যাই।"

"না," ঋতি চোয়াল শক্ত করল, "আমার ঘুর হয়ে যাবে।"

দীপ্য যেন শুনলই না! বরং বলল, "ভাল কথা, তুই আমায় লাখ দুয়েক টাকা লোন জোগাড় করে দিতে পারিস?"

"লা-লাখ দুই?" অবাক হল ঋতি, "এত টাকা পাব কোথায়? কী হবে এত টাকা দিয়ে? কতবার বলেছি এসব জুয়া-ফুয়া খেলো না। কেন কথা শোনো না আমার?"

"ভাটের কথা বলিস না তো," দীপ্য রেগে গেল, "পারবি না ঠিক আছে। আমি কী করব তোকে বলতে বলেছি? আমি তোকে বলি কী করতে হবে!"

ঋতি বলল, "কী হয়েছে তোমার? এমন খিটখিট করছ কেন?"

দীপ্য বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকাল ওর দিকে। তারপর বলল, "আমি আসছি। ফালতু বকতে ভাল লাগছে না। শালা বহুত চিপকু হয়ে গেছিস আজকাল!"

বৃষ্টিটা বাড়ল আবার। একটা শেডের তলায় গিয়ে দাঁড়াল ঋতি। দেখল, ও ভিজছে দেখেও দীপ্য পাত্তা না দিয়ে নিজে ছাতা নিয়ে চলে গেল!

বৃষ্টি কি আবছা করে দিচ্ছে দীপ্যকে? নাকি ওর চোখে জল? কাকে ভালবাসে ঋতি? কার জন্য সবাইকে তুচ্ছ করে? কার জন্য সব ছেড়ে আসে ও?

মেঘ ভেঙে একটা বিদ্যুতের ডাল আছড়ে পড়ল আকাশে। তীব্র রাগ নিয়ে পৃথিবীর ব্রহ্মতালু ফুটো করে দিতে যেন দ্বিগুণ বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল বৃষ্টি। ঋতি বুঝল এবার পুরো ভিজে যাবে ও।

"আমার ছাতাটা নিয়ে যান।"

চেনা গলার আওয়াজে চমকে পিছনে তাকাল ঋতি। আরে ও এখানে!

"নিন ছাতাটা। আমার দোকান কাছেই। আমি দৌড়ে চলে যাব। আপনি নিয়ে যান ওটা। কাল দোকানে দিয়ে যাবেন না হয়।"

বৃষ্টির পর্দার ওপারে মুখটা কেমন যেন পেন্সিল স্কেচের মতো লাগছে। ওর সঙ্গে কথা বললেও কিন্তু তাকিয়ে নেই ওর দিকে। মাথা নিচু। গলায় বিষণ্ণতা। আবার একটা আলোর ডাল ভাঙল আকাশে। আর তার সঙ্গে বহুদিন আগের প্রায় ভুলে যাওয়া ঘটনাটা কেমন যেন আচমকাই মনে পড়ে গেল ঋতির। সেদিন এমন করেই এসে দাঁড়িয়েছিল না ও? এমন বৃষ্টিই পড়ছিল না সেই সন্ধেটায়?

ঋতি দেখল ছাতাটা একরকম জোর করেই ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে মানুষটা বৃষ্টি ভেঙে মিলিয়ে গেল দূরে।

ও বুঝল আজ আর সেই দশ বছর আগের সন্ধের মতো মানুষটা ওকে বলতে দিল না কিছু!

৫

মেসেজটা পাঠিয়ে ফোনটা সুইচ অফ করল গুলি। তারপর মাথাটা চিৎ করে দাঁড়াল একটু।

রাত নেমে আসছে কলকাতায়।

মেঘের ফুটো-ফাটা দিয়ে তারা দেখা যাচ্ছে দু'-একটা। সেই দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল গুলি।

ঋতিকে যে ও মেসেজ পাঠায় সেটা পৃথিবীতে কেউ জানে না। ছোট্ট দু'-

www.monersathe.com

এক লাইনের মেসেজ। তাতে আবছা প্রেমের কথা থাকে।
এই মোবাইলটার কথাও কেউ জানে না। খুব সস্তায় পাওয়া। সেকেন্ড হ্যান্ড। ঠিক মতো কথা শোনা যায় না। মেসেজটা করা যায় শুধু।
এই কাজটা করতে কেমন যেন একটা চাপা উত্তেজনা হয় গুলির। মনে হয় নিষিদ্ধ কিছু করছে যেন! ওর মুড়ি-বাতাসের জীবনে এ যেন ফুচকাওলার রগরগে আলুর দম! তাও এটা করে ও। ঋতির সঙ্গে অদৃশ্য হলেও এক ধরনের যোগাযোগ তো!
"কীরে গুলি ঘরটা নিবি, না অন্যকে ঝেড়ে দেব?" সাইকেলটা সামনে দাঁড় করিয়ে একটা পা ফুটপাতে রেখে ওকে জিজ্ঞেস করল মোটকু পান্ডা।
গুলি ঢোক গিলল। এইরে, মিষ্টির দোকানের সামনেই এসব জিজ্ঞেস করছে মোটকুদা? ও তো বলেওছে মোটকুদাকে যে দোকানের ব্যাপারটা যেন কাউকে না জানায়। লোকটা শুধু মোটাই নয় মাথা মোটাও বটে! দোকানে কয়েকজন কর্মচারী রয়েছে। যদি শুনতে পায় তবে জগামামার কানে কথাটা পৌঁছতে সময় লাগবে না।
গুলি দ্রুত মোটকুকে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল, "কী করছ মোটকুদা! বলেছি না ব্যাপারটা প্রাইভেট।"
"ওহো, তাই তো... পেরাইভেট!" মোটকু তরমুজের বিচির মতো দাঁত দেখিয়ে হাসল, "তোর মামাটা তো জানে না! কিন্তু গুলি আমার কথাটাও বোঝ। তুই ভাল ছেলে, তাই এখনও ধরে রেখেছি ঘরটা। কিন্তু আর দু'হপ্তার ভেতর যদি না টাকা দিতে পারিস তবে আমি দোকানটা দিয়ে দেব।"
"আমার কাছে দশ মতো আছে মোটকুদা," গুলি নিরপায় গলায় বলল, "বাকিটা..."
"নারে ভাই। দশ নিয়ে বসে থাকলে আমার হবে? বাকি চল্লিশ কবে দিবি তার ঠিক আছে? আমার তো শালা হাতে হ্যারিকেন হয়ে যাবে। তুই তোর মামার মাথায় হাত বোলা না!"

"মানে?" গুলি ঘাবড়ে গেল।
"মানে টাকাটা মামার থেকে তোল। শালা চাকরের মতো তো খাটিস। আমরা কি বুঝি না কিছু? তাই বলছি টুপি-টাপা দিয়ে টাকাটা ম্যানেজ কর।"
"টুপি? মানে, মিথ্যে বলব মোটকুদা?"
"সত্যি বলে কোন ইয়েটা ছিঁড়লি এতদিন? শোন, যে মিথ্যেতে ভাল হয় সে মিথ্যে সত্যির চেয়ে ভাল। আর ওইটুকু টাকা তোর মামার সাগর থেকে এক ঘটি জল। মনের ভেতরের সাহসের পুঁটলির গিঁটটা খোল।"
"কিন্তু..."
মোটকু বলল, "থাক তবে বসে। কিন্তু মনে রাখিস, দু'হপ্তা।"
মোটকু পান্ডা মাল বোঝাই লরির মতো চলে গেল।

মেসেজ পাঠাবার পরে যেটুকু সময় একটা অদ্ভুত ভাললাগা থাকে গুলির মনের মধ্যে, সেটা চটকে দিয়ে চলে গেল লোকটা। এখন টাকা পাবে কোথায় ও?

কাজটা করতে কেমন যেন একটা চাপা উত্তেজনা হয় গুলির। মনে হয় নিষিদ্ধ কিছু করছে যেন!

গতকাল বাড়িতে ফোন করেছিল গুলি। মায়ের কাছে একটা মোবাইল ফোন রেখে এসেছে। দায়ে দরকারে ফোন করে। সাধারণ দু'-একটা কথার পর মা বলেছিল, "আমাদের গোরুটার শরীরটা ভাল নেই। বয়স তো অনেক হল। আর মনে হয় বাঁচবে না। তাও চিকিৎসা তো করাতে হবে। কিছু টাকা পাঠাতে পারবি বাবু?"
গুলির জিভ শুকিয়ে গিয়েছিল। ও ভেবেছিল মাকে বলবে ওদের পুকুরটা বিক্রি করা যায় কিনা! কিন্তু উলটে মা যে এমন একটা কথা বলবে বুঝতে পারেনি।
"কত মা?" জিজ্ঞেস করতেও যেন ভয় লাগছিল গুলির।
"হাজার পাঁচেক। জগাকে বললেই ও দিয়ে দেবে।"
জগা কি গৌরী সেন নাকি? মা এখনও বোঝে না জগামামা লোকটা কেমন! কোনওদিনও বুঝবেও না। এমন অন্ধ ভাল মানুষ হওয়ার কোনও মানে আছে?
গুলি ফোন রাখার আগে বলেছিল ও পাঠিয়ে দেবে টাকা।

পনেরো থেকে পাঁচ গেলে থাকে দশ। তাই দশ হাজার টাকার কথা ও বলেছিল মোটকুকে।
সন্ধেটা আজ বড় এলোমেলো লাগছে। এখনও বাকি দোকানগুলো ঘুরে সারা দিনের কালেকশন বুঝে নিতে হবে। কিন্তু ভাল লাগছে না কিছুতেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলল গুলি।

"শুনেছ গুলিদা কেসটা?"
গুলি মাথা ঘুরিয়ে দেখল মিষ্টির দোকান থেকে নব বেরিয়ে এসেছে।
ছেলেটার বয়স অল্প। বেঁটে কালো। গুলির পিছন পিছন ঘোরে। কে জানে গুলিকে কী ভাবে ও!
"কী কেস?"
নব গলা নামিয়ে বলল, "ঋতিদির কেস। ওদের পাড়াতেই তো থাকি আমি। শুনেছ?"
আচমকা নামটা শোনায় ঠিক যেন কারেন্টের শক লাগল গুলির। নিমেষে কান গরম হয়ে গেল। কোনওমতে বলল, "কী?"
"আরে কাল রাতে ওদের বাড়িতে বিশাল বাওয়াল। ঋতিদি নাকি পেগনেন!"
"কী?" গুলি ঠিক বুঝতে পারল না।
"আরে পেগনেন গো। পেটে বাচ্চা এসেছে। বোঝো কেস!"
গুলি তাকিয়ে রইল নবর দিকে। এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না কী বলতে চাইছে ছেলেটা! কোনও বাচ্চা বেড়াতে এসেছে ঋতিদের বাড়ি?

৬

পুরনো দিনের রেডিওর মতো এক টানা কেঁদে চলেছে মা। কোথা থেকে তৈরি করে এত চোখের জল? আর এই যে একটা খোনা শব্দ করছে, এতে গলা ব্যথা করছে না!
খাতা দেখা বাকি আছে অনেক। কিন্তু মন বসছে না ঋতির। মুখটা তেতো হয়ে আছে। পরপর যা ঘটে গেল তাতে এমনটা হওয়াই তো স্বাভাবিক!
পেনটা টেবিলে রেখে বিছানায় শুয়ে থাকা মাকে দেখল ঋতি। কেমন গুটিয়ে আছে। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে সেই সকাল থেকে শুয়ে আছে মা। গত কয়েকদিন ঋতির সঙ্গে যুদ্ধ করার পর বুঝেছে যে বাচ্চাটা নষ্ট করবে না ও। তাই আজ সকাল থেকে অন্ন-জল ত্যাগ করে শুয়ে আছে।
ঋতি কয়েকবার বলেছিল এমন সিন ক্রিয়েট না করতে। মা শোনেনি। বলেছে

www.monersathe.com

ঋতির সঙ্গে নাকি কোনও সম্পর্কই আর নেই।
ব্যাপারটা নিয়ে প্রথমে রাগ ছিল ওর। কিন্তু এখন বিরক্তি আসছে। ও জানে এখনও কুমারী মা ব্যাপারটা মধ্যবিত্তের গলা দিয়ে নামে না। আর সমস্ত ঘটনা চলতে পারে কিন্তু এই কনসেপ্টটা এখনও কেউ যেন মানতে পারে না!
দীপ্য যে এত বড় বড় কথা বলে, সেও তো মানতে পারেনি। প্রথমে শুনে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। বলেছিল, "সেকি? এসব আবার হল কী করে?"
"হল কী করে মানে?" ঋতি অবাক হয়েছিল, "জানো না কী করে হয়? তোমার সঙ্গে শুয়েই হয়েছে। আমি তো আর অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন করতে পারি না।"
"না মানে," দীপ্য মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল, "তুই প্রিকশন নিসনি।"
"তোমায় বলতাম কন্ডোম ইউজ করতে, তুমি কান দিতে আমার কথায়?"
দীপ্য বিরক্ত হয়ে বলেছিল, "তা বলে তুই নিবি না? দিলি তো আমায় ফাঁসিয়ে! শালা কথা নেই, বার্তা নেই বাচ্চা! যেন দুপুরবেলার সেলসম্যান!"
"কী বলছ দীপ্য!" ঋতির রাগ হচ্ছিল এবার।
"শোন যা হয়েছে, হয়েছে। মালটাকে অ্যাবর্ট করে দে।" দীপ্য বিরক্তির গলায় বলেছিল।
"মাল! না, আমি অ্যাবর্ট করাব না।" প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল ঋতি।
"করবি না? আমায় ফাঁসাতে চাইছিস? শোন, তোকে বিয়ে করতে পারব না আমি। মনে নেই কী বলেছিলাম আলাপের সময়? এসবে আমি ঢুকব না।"
"তোমায় বিয়ে করতে বলেছি আমি?" ঋতি উঠে দাঁড়িয়েছিল, "আমি যা রোজগার করি তাতে কারও সাহায্য লাগবে না। তোমার বাচ্চা তাই জানালাম।"
"তেজ দেখাবি না একদম। আমার দিকে আঙুল তুলবি না," দীপ্য হিসহিসে গলায় বলেছিল, "আমি একাই মজা নিয়েছি নাকি?"
"মজা?" ঋতি দাঁতে দাঁত ঘষে বলেছিল, "এটা বলতে পারলে? ভালবাসাকে মজা করে দিলে?"
"শোন কবিতাটা আমি লিখি কারণ ওটা লিখতে হয়। জীবন নিয়ে অত কাব্যি করলে হয় না। শালা এদিকে টাকা টাকা করে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল আর এ এসেছে বাচ্চা বাঁধিয়ে!"
দীপ্য কথার শেষে নোংরা গালাগালি দিয়েছিল একটা।
ঋতি বোবা হয়ে তাকিয়েছিল দীপ্যর দিকে। তারপর বলেছিল, "আর কোনওদিন তোমার মুখ দেখব না।"

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল ঋতি। আজ আবার মেঘ করে এসেছে। ঠান্ডা হাওয়াও দিচ্ছে। কাছে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে নিশ্চয়।
বুক ভরে শ্বাস নিল ঋতি। ঠান্ডা মিন্টের মতো হাওয়া! ভাল লাগল ওর। রাস্তার দিকে তাকাল একবার। ও জানে জেঠু আসবে আজ। চেন্নাই থেকে আসা ফ্লাইট ল্যান্ড করে গেছে। আসলে জেঠিমা ফোন করে বলেছে ব্যাপারটা। তাই সব কাজ ফেলে রেখে জেঠু ফিরে আসছে। একটু পরেই আবার রাম রাবণের যুদ্ধ শুরু হবে বাড়িতে!
আচমকা দূরের বড় বট গাছটার দিকে চোখ গেল ঋতির। একেই সন্ধে হয়ে আসছে, তার ওপর মেঘ ঢেকে আছে আকাশে, তাই স্পষ্ট হচ্ছে না কিছুই। তবু দূর থেকে মানুষটাকে ঠিক চিনতে পারল ঋতি। গৌরাঙ্গ। ওর দিকেই কি তাকিয়ে আছে? আচমকা গা-টা কেমন শিরশির করে উঠল ওর। হতেই তো পারে যে ওর দিকে তাকিয়ে নেই গৌরাঙ্গ। তবু কেন মনে হচ্ছে ওর দিকে তাকিয়ে আছে? ঋতিকে ভালবাসে বলেছিল বলে একদিন তো খুব অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল ওকে। তবে? এখন তো মোবাইলে টাকা রিচার্জ করার সময় এমন ভান করে যেন গৌরাঙ্গকে চেনেই না! তবে?
হঠাৎ ঋতির মনে পড়ে গেল, ইশ, ছাতাটা আজও ফেরত দেওয়া হল না!
ট্যাক্সি থেকে জেঠুকে নামতে দেখে ঘরের ভেতর ফিরে এল ঋতি। বুকের ভেতরটা কাঁপছে একটু। না, ভয়ে নয়, খারাপ লাগায়। ও জানে জেঠু জেঠিমা কী বলবে। এও জানে তা শুনে মা কী করবে। ওর খারাপ লাগছে এই ভেবে যে ওকে জেঠুর মুখে মুখে তর্ক করতে হবে।
ঠিক দশ মিনিটের মাথায় দরজার বাইরে জেঠুর গলাটা শুনল ঋতি। ও কিছু জবাব দেওয়ার আগেই দেখল মা এগিয়ে গেল দরজার দিকে। বলল, "আসুন দাদা। কী সর্বনাশ হয়েছে দেখুন!"
জেঠু সময় নষ্ট না করে জিজ্ঞেস করল, "কী শুনছি ঋতি? এসব কী?"
ঋতি একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে মাথা নামিয়ে নিল।
"কে ছেলেটা? কী নাম?"
ঋতি শান্ত গলায় বলল, "আমি বলতে পারব না।"
"ওই দীপ্য না কোন এক হারামজাদার সঙ্গে মেশে... নির্ঘাত সে।" মা ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল।
"তাকে বলেছ? সে কবে বিয়ে করবে বলেছে?" জেঠুর গলায় টেনশন স্পষ্ট টের পেল ঋতি, "আর বিয়ে না করতে চাইলে তো তার নামে পুলিশে কমপ্লেন করতে হবে। বিয়ের অ্যাশিওরেন্স দিয়ে সহবাস..."
"না জেঠু। আমি কাউকে বিয়ে করব না। কেউ কোনও প্রতিশ্রুতি আমায় দেয়নি। যা করেছি তার দায়িত্ব আমার। আমি কাউকে..."
কথা শেষ করতে পারল না ঋতি তার আগেই মা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপরে। চুলের মুঠি ধরে প্রচণ্ড এক টানে ওকে চেয়ার থেকে ফেলে দিল মাটিতে। তারপর দু'হাত দিয়ে পাগলের মতো মারতে মারতে বলল, "তুই মেয়ে না শত্রু? জন্মেই মরে গেলি না কেন? বেশ্যাপনা করার জন্য কে বেঁচে থাকতে বলেছিল তোকে? জানোয়ার..."
বৃষ্টির মতো মার পড়তে লাগল ঋতির গায়ে। ও অবশ হয়ে শুষে নিতে লাগল সব। ধীরে ধীরে বিক্রিয়াহীন হয়ে আসতে লাগল সমস্ত অনুভূতি, শরীর। তবু তার ভেতরেও যেন আবছাভাবে শুনল জেঠু বলছে, "এ নষ্টামি আমার বাড়িতে চলবে না। এখান থেকে তোকে চলে যেতে হবে। মনে রাখিস নোংরামো..."

৭

মায়ের কথাটা এখনও মাথায় ঘুরছে গুলির। পনেরো হাজার টাকা! এই তো

ট্যাক্সি থেকে জেঠুকে নামতে দেখে ঘরের ভেতর ফিরে এল ঋতি। বুকের ভেতরটা কাঁপছে একটু।

www.monersathe.com

পাঁচ ছিল গোরুর জন্য, এখন পনেরো হয়ে গেল? বাবার শরীর কতটা খারাপ হয়েছে যে এত টাকা দরকার! ওর তো নিজের সম্বল বলতে ওটুকুই, সেটাও দিয়ে দিতে হবে!

বাড়ির সামনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল গুলি। কোনও একসময় নীল ছিল আকাশটা, এখন কেমন যেন ছানি পড়া চোখের মতো হয়ে গেছে। তাই বোধহয় ভগবান আর নীচে ওর মতো মানুষদের দেখতে পান না।

মোটকু পান্ডা খারাপ লোক নয়। গুলি ভেবেছিল ঠিক ম্যানেজ করে দশ হাজার টাকা দিয়ে দোকানটা বুক করে রাখবে। কিন্তু আজ সকালে মায়ের সঙ্গে কথা বলার পর থেকে মাথাটা কেমন যেন ভোঁ ভোঁ করছে।

পাড়ার নেড়ি কুকুরের সংখ্যার মতো হু হু করে বয়স বাড়ছে ওর। এখনও তো কিছুই করে উঠতে পারল না। তবে কি জীবনটা এমন করেই যাবে?

মোটকু পান্ডার দোকান ঘরটা খুব ভাল জায়গায়। সামনে বেশ কিছু অফিস আছে। দু'টো বড় কোচিং সেন্টারও রয়েছে। যদি একবার ঠাকুর ঠাকুর করে দোকান করে ফেলতে পারে তবে আর দেখতে হবে না। কিন্তু ঠাকুর ভদ্রলোক তো একদম পাত্তাই দিচ্ছেন না ওকে!

"কীরে গুলি আজ দোকানে যাসনি?" জগামামা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল।

"না, ইয়ে, দোকানে নবকে বসিয়ে এসেছি। আসলে কাল যে বললে ব্যাঙ্কে চেকটা জমা দিয়ে কারেন্ট অ্যাকউন্টের স্টেটমেন্ট আনতে। তাই..."

"ও," জগামামা বড় সাদা গাড়িটার দিকে এগিয়ে গিয়েও থমকে দাঁড়াল, "আচ্ছা, তোর কি লোনের দরকার?"

"অ্যাঁ?" গুলি থতমত খেল। তবে কি আকাশের ঝাপসা ভাব কিছুটা কমলো? ভদ্রলোক কি দেখতে পাচ্ছেন ওকে?

"শোন, তোদের গ্রামের জমি, পুকুর আর বাড়িটা আমায় লিখে দে। হাজার তিরিশেক টাকা দিয়ে দেব। ভাব একবার তিরিশ হাজার টাকা! চাট্টিখানি কথা নয় কিন্তু!" জগামামা এমন করে হাসল যেন কয়েক কোটি টাকার কথা বলছে।

ছিল পঞ্চাশ আর এখন হয়ে গেল তিরিশ হাজার? চোয়াল শক্ত করল গুলি। ও কি গ-য়ে আকার নাকি? এই টাকায় সবটা গাপ করতে চায়! হোক না বাড়িটার একটা অংশ ধ্বসে গেছে। তাও জায়গার দাম নেই!

গুলি বলল, "সে পরে ভাবব জগামামা। এখন ব্যাঙ্কের কাজটা সেরে আসি।"

মামা হেসে গাড়িতে উঠে বলল, "বাঙালি বড্ড বেশি ভাবে তাই কাজ করে উঠতে পারে না।"

গুলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেখল সাদা গাড়িটা চলে গেল নিঃশব্দে।

ব্যাঙ্ক কাছেই। কাজটাও বিশেষ জটিল নয়। ওখানের কাজ সেরে ও যাবে দীপ্যর বাড়িতে। আজ সকালে দীপ্য যখন জগামামার কাছে এসেছিল তখন গুলিকে বলে গেছে যেন দুপুরে হোম ডেলিভারি থেকে খাবারটা একটু এনে দিয়ে যায়। হোম ডেলিভারির ছেলেটা নাকি যেতে পারবে না আজ। আর দীপ্যরও পায়ে ব্যথা!

পায়ে ব্যথা না ছাই। হাতে টিফিন বক্স নিয়ে হাঁটতে বোধহয় প্রেস্টিজে লাগবে! দীপ্যকে দেখলেই মাথার ভেতরটা দপ করে ওঠে ওর। মনে পড়ে যায় ঋতির কথা। মা হতে চেয়েছে ঋতি! আর কার সন্তান? না এই জুয়াড়ি লোকটার? কথাটা মনে পড়লেই বুকের ভেতরে অদ্ভুত একটা কষ্ট হয়। মনে হয় কে যেন খুঁচিয়ে গর্ত করছে হৃদপিন্ডে!

ও শুনেছে ঋতি কিছুতেই বলছে না কার সন্তান! কিন্তু মানুষ তো আর বোকা বা অন্ধ নয়! তাছাড়া গুলি নিজে দেখেছে দীপ্যর ঘরে খুলে রাখা কুর্তি! এই লোকটা শুয়েছে ঋতির সঙ্গে আর তার কাজ করে দিতে হবে ওকে!

নিজের ভেতরে কয়েকটা দিন খুব যুদ্ধ হয়েছে গুলির। তারপর মনে হয়েছে ঋতি তো নিজেই ভালবেসেছে দীপ্যকে। নিজের থেকেই তো গেছে ওর কাছে। তবে গুলি আর কী করতে পারে!

আজ সকালে দীপ্য এসেছিল ওদের বাড়িতে। জগামামার কাছে নিজের মায়ের গয়না বিক্রি করে দু'লাখ টাকা নিয়ে গেছে।

একবার এই ধরনের একটা বুদ্ধি দীপ্যকে দিয়েছিল গুলি। দীপ্য প্রথমে পাত্তা না দিলেও আজ সকালে জগামামার কাছে ও আসাতে গুলি বুঝেছে যে মানিক সরখেল নিশ্চয় এবার আলটিমেটাম দিয়েছে। হয়তো বলেছে মেরে দেবে।

মানিক সরখেল মেরে দিতেই পারে। সবাই জানে মানিকের টাকা সময় মতো না ফেরত দিলে মানিক তাকে ছাড়ে না।

জগামামা ঘর থেকে সবুজ প্ল্যাস্টিকের ব্যাগে টাকাটা মুড়িয়ে নিয়ে যখন দীপ্য বেরছিল, গুলির মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল একদম।

দীপ্য প্ল্যাস্টিকটা দেখিয়ে বলেছিল, "তোদের মিষ্টির দোকানের প্ল্যাস্টিক দেখ। মায়ের শেষ স্মৃতিটাও দিয়ে দিতে হল। মানিক মালটা..."

গুলি কী বলবে বুঝতে না পেরে দুঃখ দুঃখ মুখ করে তাকিয়েছিল।

দীপ্য বলেছিল, "পায়ে একটা ব্যথা হচ্ছে বুঝলি। হোম ডেলিভারি থেকে খাবারটা একটু এনে দিবি? ডেলিভারি বয়টা আজ আসবে না!"

গুলি আর চিন্তা না করে ব্যাঙ্কের দিকে এগোলো। সেখান থেকে বেরিয়ে দীপ্যর খাবারটা তুলে নেবে। তবে পথে জগামামার বউ মানে মামির জন্য ওদের দোকান থেকে ঠাকুরের সন্দেশটাও নিয়ে নেবে। ভুলে গেলে ওকেই আবার বেরতে হবে।

খাবারের টিফিন ক্যারিয়ারটা নিয়ে গুলি যখন দীপ্যর ঘরে পৌঁছল, গামছা পরে দীপ্য তখন স্নানের তোড়জোর করছে। ওকে দেখে বলল, "আমি চট করে পটি আর স্নানটা সেরে আসি। তুই একটা কাজ কর। ওইখানে দেখ কালকের টিফিন বক্সটা রাখা আছে। যাবার সময় নিয়ে গিয়ে হোম ডেলিভারির দিদিকে দিয়ে দিস।"

গুলি দেখল লন্ডভন্ড ঘরটার এক কোনায় টেবল। তার ওপর সেই সবুজ প্ল্যাস্টিকটা রাখা! আর পাশেই দাঁড়া করানো হয়েছে টিফিন বক্স।

দীপ্য বলল, "আমি যাচ্ছি। তুই দরজাটা টেনে দিয়ে যাস।"

গুলি বিছানাটার দিকে তাকাল। এই সেই জায়গা! বুকের ভেতর আবার কে যেন ড্রিল করা শুরু করেছে। এইখানেই দীপ্য

নিজের ভেতরে কয়েকটা দিন খুব যুদ্ধ হয়েছে গুলির। পরে মনে হয়েছে ঋতি নিজেই তো ভালবেসেছে দীপ্যকে।

www.monersathe.com

আদর করেছে ঋতিকে! এখানেই ঋতিকে... চোখের সামনে ছিটকে উঠল কিছু দৃশ্য! যন্ত্রণায় বেঁকে গেল ওর মুখ। আর ভাবতে পারল না গুলি। ফাঁকা ঘরে বন্ধ করে নিল চোখ দু'টো।

৮

এই জায়গাটা নতুন। এখানে বারান্দায় দাঁড়ালে অনেকটা দূরের কলকাতা দেখা যায়। নর্থ-এর ভিড় থেকে সরিয়ে এনে সাউথ কলকাতার এই ন'তলার ব্যালকনিটা ঋতিকে যেন আকাশের অনেক কাছে এনে দিয়েছে।
এখান থেকে কলেজে যেতে একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু সেটা ওই বাড়িতে থাকার কষ্টের চেয়ে অনেক কম।
এই ফ্ল্যাটটা ওর এক কলিগের। নাম লাবানা। কলেজে ইকনমিক্স পড়ায় ও। ঋতির খুব ভাল বন্ধু। লাবানাদের বাড়ির অবস্থা খুব ভাল। বাবা মা থাকে চণ্ডীগড়ে। আর এখানে এই ফ্ল্যাটে একা থাকে ও। ঋতিকে ও-ই নিজের থেকে বলেছে ফ্ল্যাটে এসে থাকতে। ঋতি আপত্তি করেনি। আপত্তি করার মতো পরিস্থিতি তো নেই ওর। তবে টাকা দিয়েই থাকবে বলেছে ঋতি। লাবানা একটু আপত্তি করেছিল বটে কিন্তু ঋতির মনের অবস্থা বুঝে আর নিষেধ করেনি।
দু'সপ্তাহ হয়ে গেল ওই বাড়ি থেকে চলে এসেছে ঋতি। কিন্তু না মা, না জেঠ জেঠিমা, কেউ ওর কোনও খবরই নেয়নি। যেন তারা ভুলেই গেছে ঋতি নামে কেউ একজন ছিল!
ঋতি মাঝে মাঝে ভাবে সমাজ আর লোকলজ্জা কি স্নেহ ভালবাসার চেয়ে দামি? ভাবে, বাবা মায়েরা কি তবে দ্বিধাহীন আনুগত্যই চায় সন্তানদের থেকে? তারা জন্ম আর ভালবাসা দিয়েছে বলেই কি চায় সন্তান নিজেকে সমর্পণ করুক তাদের পায়ে?
শেষ দু'সপ্তাহে মা যে কী পরিমাণ হেনস্থা করেছে ওকে সেটা আর মনেও আনতে চায় না ঋতি। এমনকী একদিন তো বলেছিল, "লাথি মেরে তোর পেট খশিয়ে দেব হারামজাদি! কোন পাপে পেটে ধরেছিলাম তোকে? শরীরের এত গরম যখন তখন রং মেখে রাস্তায় দাঁড়ালেই তো পারিস!"
খারাপ কথা সহ্য করতে পারে না ঋতি। গালাগালি দেওয়া, অসভ্য ভাষা ব্যবহার করা কোনওদিনই পছন্দ করে না ও। তাই নিজের মা এমন ভাষা ব্যবহার করছে দেখে ভেতরে ভেতরে মরে যাচ্ছিল ও। আর বুঝতে পারছিল, মানুষ শুধু শরীরের মৃত্যুটাকেই প্রাধান্য দেয়। সে সারা জীবন ধরে মনে মনে কতবার যে মরে তার কোনও হিসেব কেউ রাখে না!
শেষের চারদিন তো ঋতিকে প্রায় ঘরে বন্দি করে রেখেছিল মা। জেঠরাও যোগ্য সঙ্গত দিয়েছিল। শুধু ফোনটা কেড়ে নিতে পারেনি। আর তার মাধ্যমেই লাবানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল ঋতি। লাবানা আর ওদের এন.জি.ও-র দুই দিদি এসে একরকম উদ্ধার করেই নিয়ে এসেছিল ঋতিকে। মা আপ্রাণ ঝগড়া করেছিল। কিন্তু পারেনি আটকাতে। লাবানা তো পুলিশের ভয়ও দেখিয়েছিল।
মা দৌড়ে গিয়ে বাথরুম থেকে অ্যাসিডের শিশি নিয়ে এসে বলেছিল, "আমি এটা খাব বলে দিলাম। ঋতি তুই বাড়ি থেকে এক পা বেরলেই আমি গলায় ঢালব।"
লাবানা বলেছিল, "দিদিরা কিন্তু মোবাইলে এটা রেকর্ড করে নিয়েছে। পুলিশে এটাও দেব আমরা। ব্ল্যাকমেল করছেন? ঋতি ঠিক করেছে না ভুল করেছে সেটা ও বুঝবে। আপনি সরে যান বলে দিচ্ছি।"
জেঠ পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে নিয়ে মাকে চুপ করিয়েছিল। তারপর বলেছিল, "ঋতিকে আমি বলেছি, বিয়ের কমিটমেন্ট করে সহবাস করলে আমরা আইনের ব্যবস্থা নিতে পারি। এটা একটা ক্রাইম।"
ঋতি বলেছিল, "আমি যা করেছি তা জেনেই করেছি। আর সে কোনও প্রতিশ্রুতি দেয়নি। তার মতো আমারও ইচ্ছে ছিল।"
"বেহায়া," মা আচমকা এসে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিয়েছিল ঋতির গালে, "লজ্জা করে না তোর। নিজের জ্যাঠাকে এসব বলছিস! তুই... তুই আমার কাছে মরে গেছিল। যা, দূর হয়ে যা।"
মা ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েছিল মাটিতে। ঋতির খুব ইচ্ছে করছিল মাকে শান্ত করে। গিয়ে জড়িয়ে ধরে বলে, "আমি যাই করে থাকি তা বলে কি তোমায় ভালবাসি না মা? তোমার মেয়ে কি আমি নই!" কিন্তু পারেনি।

এত ওপরে হাওয়ার জোর খুব বেশি। চুলগুলো কেমন যেন এলোমেলো

www.monersathe.com

হয়ে যাচ্ছে। তবে ঠিক করল না ও। অত ঠিক করে কী হবে?
একবার নিজের পেটের ওপর আলতো করে হাত বোলাল ঋতি। এখনও মাতৃ-লক্ষণ প্রকাশ পায়নি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে নতুন জন্ম নেওয়া মা-টাকে আজকাল বুঝতে পারে ঋতি। সাবধানে চলা ফেরা করে। ঠিক মতো ওষুধ খায়। যে এখনও আসেনি তার জন্য কেমন একটা অদ্ভুত টান অনুভব করে! আর তাই নিজের মায়ের অমন খারাপ ব্যবহারের পরেও মায়ের ওপর রাগতে পারে না একটুও। বরং কোথায় যেন মনে মনে মায়া হয় মায়ের জন্য। দিনে দিনে যেন বুঝতে পারে মা কেন অমন আচরণ করেছিল ওর সঙ্গে।
তবে ঋতি এও ভাবে নিজের সন্তানকে ও অন্তত ভালবাসার নামে বন্দি করতে চাইবে না। ওর ভালবাসার দায় ও কখনই চাপাবে না নিজের সন্তানের ওপর।
লাবানা ওকে সাপোর্ট করে খুব। সেইদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে এসেছিল ঋতিকে। কয়েকদিন সময় দিয়েছিল ওকে সামলে ওঠার। তারপর তুলেছিল দীপ্যর প্রসঙ্গ।
ঋতি লাবানাকেই একমাত্র বলেছিল দীপ্যর কথা। তাই লাবানা জিজ্ঞেস করেছিল, "তুই দীপ্য মালটাকে ধরিসনি? যতই দায়িত্ব এড়িয়ে যাক, কিন্তু একটা যোগ তো তাও থেকেই যায়। না?"
ঋতি মাথা নামিয়ে নিয়েছিল। আসলে ও তো সেই দিনটার পরে আর একদিনও গিয়েছিল দীপ্যর কাছে। এই বলতে গিয়েছিল যে ও বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু সেদিন দীপ্য যে কী খারাপ ব্যবহার করেছিল!
দীপ্য বলেছিল, "আবার তুই বাচ্চা নিয়ে ঘ্যানাতে এসেছিস! শালা বলছি টাকার দরকার আমার। নাহলে মানিক সরখেল আমায় বাঁশ দিয়ে ছেড়ে দেবে। আর তুই খালি বাচ্চা বাচ্চা করছিস কেন?"
"আমি তো সেইজন্য আসিনি!"
অসহায়ের মতো বলেছিল ঋতি।
"দেখ, তোর ধান্দা আমি বুঝি। বিয়ে করতে হবে তোকে, এই তো? ঠিক আছে আমি রাজি। শোন, তোর জেঠুকে গিয়ে বলব এই বাচ্চাটা আমার। বিয়েও করব। কিন্তু আমায় নগদ তিন লাখ টাকা দিতে হবে।"
"কী?" নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না ঋতি, "তুমি কী বললে? তুমি না কবিতা লেখো!"
"তো? কবিতা লিখলে কী হয়? শেক্সপিয়ারও লিখত তার আগে চসারও লিখত। তারা কি সব সাধু ছিল নাকি? ওসব ফালতু কথা বলিস না। আমায় শেখাতে আসিস না কবিতা কেমন হয়! এক একটা যন্তর জিনিস! কাঠিবাজি করে সময় পায় না কবিতা লিখবে! দেখ, তিন লাখ টাকা অ্যারেঞ্জ করে দে, বাচ্চাটা আমার বলে মেনে বিয়ে করে নেব।"
"বাচ্চাটা তোমার বলে মানে? আমি কি মিথ্যে বলছি?" রাগে সারা শরীর কাঁপছিল ঋতির।
"কোথায় কী করে বেড়াস সেটা কি আমি জানি? দেখ, হিসেবটা সোজা। তোর একটা বর লাগবে আর আমার টাকা। এখন ভাব।"
"আমার কোনও বরের দরকার নেই। আর থাকলেও তোমার মতো জানোয়ারের তো দরকার নেই-ই।" ঋতি আর দাঁড়ায়নি। লাবানা সবটা শুনে চুপচাপ বেরিয়ে গিয়েছিল ফ্ল্যাট থেকে। তারপর রাতের দিকে ফিরে এসে বলেছিল, "তুই ঠিক বলেছিস ঋতি। লোকটা জানোয়ার। জানিস আমি গিয়েছিলাম ওখানে। লোকটা পালিয়েছে। কার জানি টাকা মেরে দিয়েছে। সে তো ওকে পেলে খুন করে দেবে। তাই আর নেই। কোথায় যেন গা-ঢাকা দিয়েছে।"
কথাটা শুনে কিছুই তেমন মনে হয়নি ঋতির। বরং বুঝতে পেরেছিল রোম্যান্টিসিজমের সতীচ্ছদটা ছিন্ন হয়েছে। বুঝতে পারছিল ওটা আসলে একটা ইউজলেস ইস্যু আবাউট আ টিস্যু!

বেলটা বাজল কি? বারান্দার থেকে ঘরের ভেতরে দিকে ফিরল ঋতি। আজ যায়নি ও। লাবানা গেছে। ফলে বাড়ি ফাঁকা। যে দিদি ওদের কাজ করে দিয়ে যায় সে তো চলে গেছে, তবে? এমন সময় কে এল? বারান্দা থেকে ঘরের দিকে এগোল ঋতি। বেলটা বাজল আবার। কে বেল বাজাচ্ছে? ঋতি দ্রুত পায়ে দরজার কাছে গেল। নীচের সিকিউরিটি কি জায়গায় ছিল না! ব্যাটা মাঝেমাঝেই যে কোথায় যায়! কতবার সেই সুযোগে সেলসম্যানরা ঢুকে পড়ে। নাহ, এবার কমপ্লেন করতেই হচ্ছে। বেলটা বাজল আবার। "আসছি" বলে ঋতি গিয়ে দাঁড়াল দরজার সামনে। ম্যাজিক আই-তে চোখ রাখল। একটা শার্ট দেখা যাচ্ছে শুধু। কে রে বাবা? ঋতি লক ঘুরিয়ে খুলল দরজাটা।

৯

সামনে বন্ধ হয়ে গেল দরজার পাল্লা। করিডোর দিয়ে ফিরতে লাগল ও। এবার লিফট ব্যবহার করতে অসুবিধে নেই। ওপরে ওঠার সময় দারোয়ানটা জায়গায় ছিল না। তখন লিফট ব্যবহার করতে গেলে দারোয়ানটার ফিরে আসার চান্স ছিল। ন'তলায় হেঁটে উঠতে কষ্ট হয়েছে খুব। তবু কেষ্ট ঠাকুর যে চিরটাকাল কষ্টের ওপারেই বসেই থাকেন।
এখন লিফটের কল বাটনটা টিপল গুলি। সাহস জিনিসটা কোথায় থাকে? কীভাবে সেটাকে আয়ত্ত করে মানুষ? সেটা কি আচমকা আসে, না তার জন্য অনুশীলন প্রয়োজন?
দীপ্যর ঘরের টেবলে সেদিন পড়েছিল সবুজ প্ল্যাস্টিকের প্যাকেটা। ওদের মিষ্টির দোকানের প্যাকেট। বাথরুমে চলে গিয়েছিল দীপ্য। আর অন্ধ রাগের তলায় তলায় গুলির মাথার ভেতরে হিসেব চলছিল দ্রুত। সামনে পড়ে রয়েছে টাকা। ওর দরকার ওটা। খুব দরকার। বাবা মায়ের জন্য দরকার। ওর নিজের জীবনের জন্য দরকার। কিন্তু তা বলে চুরি করবে? মিথ্যেচার করবে? বিশ্বাস ভাঙবে? ওর চোখ আবার চলে গিয়েছিল বিছানার দিকে। আর বিদ্যুতের মতো ফের সপাং করে মনের ভেতরে আছড়ে পড়েছিল দৃশ্য। ঋতির ওপর আঁকড়ে রয়েছে দীপ্য! শয়তান! সামান্য মানুষ গুলি। সম্মুখ সমরে শয়তানের সঙ্গে সে পেরে উঠবে কেমন করে? কিন্তু শয়তানটাকে শাস্তি দিতে যে খুব ইচ্ছে করে ওর! যে মেঘের আড়ালে যুদ্ধ করে, যে ছলের আশ্রয় নেয়, তাকে তো ছল দিয়েই বধ করতে হয়! আদিগ্রন্থ তো তাই নির্দেশ করে দিয়েছে বারবার। নিকুম্ভিলা তো সাক্ষী হয়ে রয়েছে!
দ্রুত মামির ঠাকুরের জন্য নেওয়া মিষ্টির প্যাকেটটা বের করেছিল গুলি। সবুজ প্ল্যাস্টিকে মোড়ানো মিষ্টিটা দেখতে ঠিক টাকার প্ল্যাস্টিকের মতো লাগছিল। বিকেলের মুখে ওর ছোট দোকানটায় এসেছিল দীপ্য। চিৎকার করেছিল খুব। 'চোর' 'ডাকাত' ছাড়াও বাছাবাছা গালাগাল দিয়েছিল। এমনকী কাউন্টার থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে চড় থাপ্পড়ও মেরেছিল। বলেছিল, "শুয়োরের বাচ্চা, তোকে বিশ্বাস করেছিলাম আর তুই টাকা সরালি! যদি টাকা না দিস তোর গুষ্টির শ্রাদ্ধ করব আমি!"
লোক জমে গিয়েছিল চারদিকে। আশেপাশের দোকান থেকে লোকজন এসে ছাড়িয়েছিল গুলিকে। মার খেয়ে শরীরের ভেতরটা কেমন যেন আলগা লাগছিল গুলির। মনে হচ্ছিল হাড়-গোড় সব ঝুরঝুর করে পড়ে যাবে। তবু স্বীকার

www.monersathe.com

করেনি ও। বলেছিল, "কোন টাকা দীপ্যদা? আমি কোনওদিনও এক পয়সাও নিয়েছি তোমার?"
চলে যাওয়ার আগে দীপ্য বলেছিল, "শালা, তুই আমার টাকা হজম করার তাল করেছিস! একটা রাত সময় দিলাম। কাল যদি সকালের মধ্যে টাকা না দিস, তবে পুলিশে দেব তোকে।"
সবাই তাকিয়েছিল গুলির দিকে। কালসিটে পড়া কপাল আর থুতনি নিয়ে কোনওমতে দোকানে ঢুকেছিল গুলি। চোখ বন্ধ করে বসেছিল।
সন্ধের পরে মানিক সরখেলকে পেয়ে গিয়েছিল বাড়ির সামনেই। গাড়ি থেকে নেমে লোকটা ঢুকছিল ভেতরে। গুলিকে দেখে থমকে গিয়েছিল, "কী রে তুই? শুনলাম আজ ওই কবিটা তোকে কেলিয়েছে? কেন?"
গুলি বলেছিল, ''মানিকদা আসলে ও নিজের মায়ের গয়না আমার মামাকে বেচে টাকা নিয়েছে। সেটা আমি জানতাম। ওকে বলেছিলাম আপনার ধারটা মিটিয়ে দিতে। সেটাই দোষ হয়েছে আমার। তাই আমার দোকানে এসে আমায় চোর অপবাদ দিয়ে মেরেছে। সবার সামনে হাঙ্গামা করে প্রমাণ করতে চেয়েছে যে আমি ওই টাকা চুরি করেছি! ওর কাছে টাকা নেই। এটা জানলে তো আপনি আর ওকে কিছু করবেন না। আসলে আপনার টাকাটা দেবে না আর কী! তাই নাটক করছে সবার সামনে! কাল আমায় পুলিশে দেবে বলেছে। এখন কী যে করি! আমি গরিব মানুষ!"
"আমার টাকা দেবে না?" মানিকের চোখে ক্ষ্যাপা ষাঁড় দেখেছিল গুলি। "দু'লাখ টাকা! আমায় তো ছোট থেকে চেনেন কোনওদিন দেখেছেন এক পয়সাও এদিক ওদিক করতে! আর আজ আমায়..." গুলি মাথা নিচু করে নিয়েছিল, "নিজে টাকাটা সরিয়ে এখন আমায় ফাঁসিয়ে আপনার টাকা মারতে চাইছে!"

লিফটের ভেতরটা নরম আলোয় মোড়া! গুলি ভেতরে ঢুকে স্টেনলেস স্টিলের পাতে নিজেকে দেখল। এমন সাহস তবে ওর ভেতরেও ছিল।
সেই রাতেই মানিক সরখেলের লোক গিয়েছিল দীপ্যর বাড়ি। পরের দিন ভোরে নব নাকি দেখেছিল কবিটি চলে যাচ্ছে পাড়া ছেড়ে। নব প্রথমে বুঝতেই পারেনি যে মানুষটা দীপ্য! দেখে মনে হচ্ছিল দলা পাকানো এক খণ্ড কাগজ!
মোটকু পান্ডার দোকানটা বুক করে দিয়েছে গুলি। বাড়িতে টাকাও পাঠিয়েছে। আর সেকেন্ড হ্যান্ড একটা জেরক্স মেশিন বায়না করেছে। কম্পিউটারটাও কিনবে। টাকাটা হাতে নিয়ে হেসেছিল মোটকু। বলেছিল, "আমার কথা শুনলি তবে!"
গুলি অবাক হওয়ার ভান করেছিল, "মানে?"
মোটকু হেসে বলেছিল, "আমি বলব না কাউকে। এ পৃথিবীতে সব শালা চোর। কেউ বড়, কেউ ছোট! মহাবিদ্যা বলে কথা। ধরা না পড়লেই হল! সত্যি তো সেটাই রে যেটা সবাই বিশ্বাস করে। আর সবাই বিশ্বাস করে তোকে!"

লিফটের ভেতর দাঁড়িয়ে হাসি পেল গুলির। একটু আগে দরজা খুলে ঋতি ওকে দেখে ভূত দেখেছিল যেন!
"তু-তুমি?"
গুলিও বলেছিল, "তোমায় একটা কথা বলতে এলাম।"
"আমায়? জানলে কী করে এখানে থাকি?"
গুলি হেসেছিল, "একদিন তোমার কলেজের সামনে থেকে তোমায় ফলো করে এই ফ্ল্যাটটা চিনে গিয়েছিলাম। আর নীচের দারোয়ানটা তো ফাঁকিবাজ তাই ঢুকতে অসুবিধে হয়নি। নাহলে এই ফ্ল্যাটটা চিনব কী করে!"
"ফলো?" ঋতি অবাক হয়ে তাকিয়েছিল, "কেন? কী চাই?"
গুলি বুঝতে পারছিল সাহস আসলে সবার ভেতরেই থাকে। তবে সেটা থাকে একটা গিঁট-বাঁধা পুঁটলির ভেতরে। একবার যদি কেউ গিঁটটা খুলতে পারে তবে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয় না।
গুলি বলেছিল, "দশ বছর আগে যত অপমানই করো না কেন আমি কিন্তু কখনও তোমার থেকে সরে যাইনি ঋতি।"
"মানে? তু... তুমি?" ঋতি বিশ্বাস করতে পারছিল না, "এতদিন ধরে..."
গুলি বলেছিল, "হ্যাঁ। আমি তোমায়..."
"ওয়েট," ঋতি হাত তুলেছিল, "তুমি জানো আমি প্রেগনেন্ট?"
"জানি। তো?"
"তো মানে?" ঋতি অবাক হয়েছিল, "শোনো, দীপ্য আমার জীবনে নেই মানেই কিন্তু এই নয় যে আমি তোমাকে... কই গত দশ বছরে তো কোনওদিন আর বলোনি! কোনও যোগাযোগ তো..."
"আমার মেসেজ পাওনি?"
"ওগুলো!" ঋতি কী বলবে বুঝতে পারছিল না, "তুমি... সামনে বলোনি কেন?"
"তখন পুঁটলির গিঁটটা খুলতে পারিনি ঋতি।"
"পুঁটলি?"
"এখন আমি নিজের মতো করে বাঁচার রাস্তা পেয়েছি। তাই ভাবলাম আর দেরি করা ঠিক হবে না।"
"কী ভেবেছ তুমি? আমায় উদ্ধার করবে? কী করে ভাবলে তোমায় ভালবাসব আমি? এমন হুট করে এসে বললেই হবে ভেবেছ? আমি সস্তা? একটা ছেলে না এলে বুঝি একটা মেয়ের জীবন পূর্ণ হয় না?" ঋতি আচমকা ফেটে পড়েছিল।
"আমি অতো জানি না!" গুলি তাকিয়েছিল শান্ত চোখে, "আমি তো ভালবেসেছি শুধু। আর তোমাকে কে বলেছে আমায় হুট করে ভালবাসতে? আমার কনসিসটেন্সি দেখো তুমি। পরীক্ষা কর। আমি তোমায় উদ্ধার করতে আসিনি ঋতি। এসেছি নিজে উদ্ধার হতে।"

গেটের কাছে দারোয়ানটা ফিরে এসেছে। গুলিকে দেখেই ধরল, "কে আপনি? ভেতরে ঢুকলেন কী করে?"
"আমি গৌরাঙ্গভূষণ মুখুটি। এখন থেকে মাঝেমাঝেই আসব।"
গুলি হাসল। মনে পড়ে গেল দরজা বন্ধ করার আগে ঋতির কথাগুলো, "কনসিসটেন্সি! আচ্ছা, দেখব। তবে অত সহজে কিন্তু হবে না কিছু। বাই দ্য ওয়ে, পুঁটলিটার গল্পটা কী? ঠিক আছে, পরেরদিন শুনব নাহয়। তবে বেশি আশা করবে না একদম। মনে রাখবে আমি কিন্তু একটুও পালটায়নি।"
কিছুই পালটায় না। গুলি জানে পালটে নিতে হয়।

অলংকরণ: বৈশালী সরকার

কালসিটে পড়া কপাল আর থুতনি নিয়ে কোনওমতে দোকানে ঢুকেছিল গুলি। চোখ বন্ধ করে বসেছিল।

www.monersathe.com